'ঘরে বাইরে' : একটি বিতর্কিত উপন্যাস

গোপা দত্তভৌমিক

১.

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের শতবর্ষ পেরোল, বিতর্কেরও একশো বছর হল বলা যায়। আজ পর্যন্ত মাঝে মাঝেই পাঠকদের মধ্যে নানা ধরনের উত্তপ্ত মতবিনিময় উপন্যাসটিকে নিয়ে ঘটতেই থাকে। এই সজীবতা উপন্যাসটির বিশেষ গুণ এবং ঔপন্যাসিকের কালের সভায় জয়লাভ তা স্বীকার করতেই হবে। এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপকে যে কাহিনি রচেছেন তা পাঠককে প্রশ্নাকুল এবং দ্বিধাসংশয়ে অস্থির করবার ক্ষমতা রাখে। লেখকের সঙ্গে অনেক পাঠকের মনে মনে জোর তর্কও হতে পারে। উপন্যাসটি প্রসঙ্গে দুটি কালবৃত্তের কথা ওঠে, একটি উপন্যাসের প্রধান ঘটনাবলি ঘটবার সময় অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের বিশিষ্ট কাল, অন্যটি যখন উপন্যাসটি রচিত হচ্ছে সেই সময়সীমা। প্রথমটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে এগোচ্ছে আর দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিক থেকে যাত্রা শুরু করেছে। এছাড়া তৃতীয় একটি কালও শতবর্ষ পার করার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটি স্পর্শ করে ফেলেছে, তাকে বলা যায় শাশ্বত। এই তিনটি কালবৃত্তের মধ্যে স্থানসীমা অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গদেশের মধ্যে আরো অনেক টুকরো টুকরো দেশ কাল লুকিয়ে আছে। এই প্রবন্ধটিতে তার সন্ধান নেবার চেষ্টা করা হবে।

'সবুজ পত্রে' 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত। এই উপন্যাস যখন মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন থেকেই চরিত্রগুলির মানসিকতা ও কাহিনীর গতি লক্ষ্য করে অনেক পাঠক এবং এক শ্রেণির সমালোচক উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছিলেন। তিনটি চরিত্রের মতামত প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই আত্মকথন রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল উপন্যাসটিতে। 'নৌকাডুবি'র মতো পাঠকের মন রক্ষা করে চলার কোনো ইঙ্গিত এই উপন্যাসে ছিল না। এই পরিস্থিতিতে একজন পাঠিকা (ঠিকানা বা নাম দেননি) লেখককে কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠান। ঠিকানা না দেওয়াতে রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেন যে এই প্রশ্ন তিনি সাধারণের হয়ে পাঠিয়েছেন এবং সাধারণের ঠিকানাতেই জবাব চান। তাই তিনি ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সুবজ পত্রে'র সটীকাটিপ্পনীতে সেই অপরিচিতা মহিলার ঠিকানাহীন চিঠির বিশদ উত্তর দেন। 'ঘরে বাইরে' পড়ার সময় এই উত্তর আমাদের লেখকের ইচ্ছে অনিচ্ছের নিশানা দেয়, তিনি কী করতে চাইছেন তারও একটা আভাস পাই। যে ধরনের অভিযোগ মহিলা তুলেছেন তাতে অবশ্য একটা সংশয় জেগে

থাকে, তিনি ইচ্ছে করেই কি ঠিকানা দেননি? রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতে হিন্দু সমাজের চরম শত্রুতা করার জন্যই 'ঘরে বাইরে' রচনা করছেন, হিন্দু সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক এমন লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখাটা হতেও পারে, তিনি বা তাঁর বাড়ির পুরুষ অভিভাবকরা পছন্দ করেননি। রবীন্দ্রনাথের লেখা হিন্দুসমাজের কাজে লাগছে না, এমনকি ক্ষতিই করছে এই অভিযোগ বহু পুরোনো। বিভিন্ন সময়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি এই মর্মে সমালোচনার শর নিক্ষেপ করেছেন। নাম না জানা লেখিকাও একই ধরনের ভর্ৎসনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তা জানাতে ভোলেননি। গল্পটি লেখার উদ্দেশ্য চিঠিতে প্রথমেই জানতে চাওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের উত্তর যথেষ্ট বেপরোয়া, 'গল্প লিখব আমার খুশি'। তারপর অবশ্য জানিয়েছেন 'লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে অথবা অগোচরে কাজ করেছে।' অবশ্য ঘরে বাইরে গল্পের মধ্যে কথাশিল্পই তৈরি হয়ে উঠেছে 'এর ভেতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।' রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অস্বীকার করেন নি.যে তাঁর ভালোমন্দ লাগাটাও স্বাভাবিক ভাবে গল্পে বোনা হয়ে যাচ্ছে তবে তার রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ।

দুদিক দিয়ে তাঁর দিকে অভিযোগের তীর ছোঁড়া হয়েছে দেশের ভালোমন্দ এবং সমাজ ও পরিবারের ভালোমন্দ। স্বভাবতই লেখকের ওপর মন্দ করার দায় চেপেছে। লেখক স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে পাঠকের সঙ্গে তাঁর মতভেদ থাকা সম্ভব। পাঠক যা চাইছে তা ফরমাশ অনুযায়ী পরিবেশন করা যে তাঁর পক্ষে জনপ্রিয়তার খাতিরে একান্ত অসম্ভব তা জানানোর সময় রবীন্দ্রনাথের স্বর যথাসাধ্য কঠোর।

> 'তাঁর সমসাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে এ কথা লেখকের ভাববার নয়, তিনি ভাববেন তাঁর গল্পটি ঠিকমতো হওয়া চাই, তাওযদি তাঁকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশে তাঁকে ভালো বলে এই কথা নয়।'

উপন্যাসটি থেকে শতবর্ষ দূরে দাঁড়িয়ে আজ আমরা বুঝতে পারি দুটি অভিযোগ তলায় তলায় জুড়ে আছে। এক অভিযোগের এপিঠ ওপিঠ বলা যায়। অর্থাৎ একই সঙ্গে লেখক দেশদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী— অন্তত প্রচলিত অর্থে। অজানা পাঠিকা প্রশ্ন তুলেছেন আখ্যায়িকাটি কি লেখকের কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবের কোথাও তার আভাস পাওয়া গেছে। যদি বাস্তবে আভাস পাওয়া গিয়ে থাকে তবে 'সেকি আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ের না প্রাচীন হিন্দু পরিবারের? রবীন্দ্রনাথের বুঝতে ভুল হয়নি যে আপাত নিরীহ প্রশ্নটির মধ্যে একটি বিশ্বাস ও অহংকার চাপা আছে যে, 'এমন ঘটনা প্রাচীন হিন্দু পরিবারে অসম্ভব।'

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে ধারালো যুক্তির অবতারণা করেছেন তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা যাক।

'প্রাচীন হিন্দু পরিবারে সর্বত্রই মানব চরিত্র কি মনুসংহিতার রাশ মেনে চলে? কখনো লাগাম ছিঁড়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ে না? আমরা বৈদিক পৌরাণিক কাল থেকে এইটে দেখে আসছি যে, বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুলের লড়াইয়ের অন্ত নেই। একদিকে শাসনও কড়া, অন্যদিকে মানবের প্রকৃতিও উদ্দাম। তাই কখনো শাসন জেতে কখনো প্রকৃতি। এই লড়াই যদি প্রাচীন হিন্দু পরিবারে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয় তবে সেই প্রাচীন হিন্দু পরিবারের ঠিকানা এখনো পাওয়া যায়নি।'

রাজার ঘরে বিমলার বিয়ে হয়েছিল রূপের জোরে নয়, সুলক্ষণা বলে। তার ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে কন্যার হাত দেখে বলেছিল 'এ মেয়েটি সুলক্ষণা, এ সতীলক্ষ্মী হবে।' তাতে সকলেরই সায় ছিল কারণ বিমলা তার মায়ের মতো দেখতে। তিনি ছিলেন সবার চোখে পুণ্যবতী, 'সতীর যশ' ছিল তাঁর। নিখিলেশদের পরিবারে তখন রূপের থেকে সুলক্ষণের দরকার বেশি পড়েছিল। নিখিলেশের বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন। কোথাও খুব বেশি স্পষ্ট না করা হলেও বোঝা যায় দুই রূপসী বিধবা বৌ সন্তানহীন, সুখহীন মরুভূমিতে কীভাবে দিন কাটাতেন। শ্বশুর পরিবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিমলা এমন একটি মন্তব্য করেছে যাতে বোঝা যায় সধবার ও বিধবার জীবনাচরণের আদর্শ একটা নতুন গুরুত্ব পাচ্ছে সমাজে যা ততটা নৈতিক নয়, যতোটা রাজনৈতিক।

'যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন।'

নব্য হিন্দুত্বের হাওয়ার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ধারণার মিশেলে ঔপনিবেশিক শাসনের গ্লানির মধ্যে হিন্দুর অন্তঃপুর এবং সেই অন্তঃপুরের কেন্দ্রীয় চরিত্র নারীর মহিমাকে স্ফীততর করে তোলার চেষ্টা একটা চাপ তৈরি করেছিল সন্দেহ নেই। নিখিলেশ অবশ্য বাইরে থেকে দেখলে এমন কোনো চাপানো তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। সে বলে স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার। বিমলার সঙ্গিনী ও শিক্ষিকা হিসেবে সে মিস্ গিলবিকে নিয়োগ করেছিল। কী শিখিয়েছিলেন মিস্ গিলবি? নিশ্চয়ই ইংরেজি ভাষা, কিছুটা সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য আদব কায়দা, বিলিতি সেলাই। বিলিতি গানও শিখিয়ে থাকতে পারেন (সত্যজিৎ রায় 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রে যেমনটা দেখিয়েছেন)। তাছাড়া বেশবাস ও কেশসজ্জাও যে শিখিয়েছেন তার কিছু প্রমাণ উপন্যাসে আছে। যেদিন সন্দীপকে বিমলা নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল — প্রথম যেদিন তাদের সাক্ষাৎ — সেদিন বিমলার সাজসজ্জায় তার প্রশিক্ষণজাত আধুনিক বেশবাস ও প্রসাধনের স্পর্শ ছিল যা লক্ষ্য করতে বিদ্রূপপ্রিয় মেজ রানীর ভুল হয়নি।

'সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম। ... গায়ে ছিল জরিরপাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজি

শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড় দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট। ... এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপরে ঠোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। ... তিনি আর একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, মন্দ হয়নি ছোটো রানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হত।'

শুকসায়রের হাট নিখিলেশের জমিদারিতেই— সেই হাটে বিলিতি কাপড়, নুন, চিনি বয়কটের জন্য সন্দীপের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর উদ্দীপ্ত বিমলা নিখিলেশকে অনুরোধ করে কার্যসিদ্ধি করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। স্বামীকে ডাকার আগে একটি বিশেষ কেশসজ্জার দিকে সে এগিয়েছিল, তা যে পুরুষচিত্তে মোহসঞ্চারের জন্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চুলবাঁধাও বিলিতি ধরনের। বিমলা জানিয়েছে, 'সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলোকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে এক রকম খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন। আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাসতেন।'

স্বামী হিসেবে নিখিলেশ স্ত্রীকে কতোখানি ভালোবাসত তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বিমলা জানিয়েছে 'সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে যেন আমার দুইকূল ছাপিয়ে তার আদরের বান ডেকে রইল।' বাড়ির সাবেক দস্তুর অনুযায়ী যখন তখন স্বামী স্ত্রীর দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। কবিতার মিলের সঙ্গে বিমলা তাদের মিলনকে তুলনা করেছে। দিনের কাজ সেরে গা ধুয়ে যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি পরে স্বামীর কাছে তার নিজেকে নিবেদনের পালা।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯০৬-০৭, উনিশ শতকের শেষ দিকেই কৈলাসবাসিনীর আত্মকথায় পাচ্ছি, স্বামী কিশোরীচাঁদ মিত্র স্ত্রীর লেখাপড়া ও সেলাই শিক্ষার জন্য মিস্ টুগোড নামে গভর্নেস রাখছেন। নানা রকম বইপত্র, খবরের কাগজ পড়ে শুনিয়ে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে, বুঝিয়ে দিয়ে স্ত্রীর ক্রমোন্নতির চেষ্টা নিজেও করেছেন কিশোরীচাঁদ, তাই কৈলাসবাসিনী তাঁকে বলেছেন 'ঘরের গুরু'। যদিও গুরুটি বিলিতি কেতায় স্ত্রীকে ডাকেন 'মাই ডিয়ার'। এ রকম দম্পতি তখন আরো অনেকেই ছিলেন। আসলে উনিশ শতকের জাতক নিখিলেশ একটি বিশেষ ভাবনার অংশীদার। সাবেকি প্রথায় দৈবজ্ঞ দিয়ে বিচার করিয়ে সম্বন্ধ করা বিয়ে হলেও স্ত্রীকে শুধু গৃহিণী রূপে না দেখে সঙ্গিনী রূপে দেখতে চেয়েছে সে। আমাদের সনাতন দাম্পত্যের ফ্রেমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত পুরুষের মন তৃপ্ত থাকতে পারেনি, পোশাকে আশাকে, পড়াশোনায়, আচার ব্যবহারে স্ত্রীর মধ্যে সে পেতে চেয়েছে পশ্চিমী ধারণালগ্ন রোমান্টিক প্রেমিকাকে। সেইসঙ্গে নিজের কাজকর্ম, পরহিতব্রত বা স্বদেশচিন্তা অথবা ধর্মচেতনায় স্ত্রীকে সে চেয়েছে অনুসরণকারিণী রূপে। 'মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু' — বিবাহ মন্ত্রে

থাকলেও অজ্ঞ মূর্খ বালিকবধূর পক্ষে কৃতবিদ্য স্বামীর নাগাল পাওয়া নেহাত অসম্ভব ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথম দশক তিনটি জুড়ে স্ত্রীকে মনোমত করে তোলার প্রচেষ্টা উচ্চশিক্ষিত বাঙালি পুরুষের অথবা ভারতীয় পুরুষের ক্ষেত্রে অব্যাহত ছিল। এই প্রচেষ্টার মধ্যে অভিভাবকসুলভ একটি গাম্ভীর্য ছিল কোনো সন্দেহ নেই। 'বাপু' এবং 'বা'র মধ্যে এই মডেলটিই কৌতূহল জাগানো রূপ দেখতে পাই। যদিও কস্তুরবা বয়সে গান্ধীর থেকে কিঞ্চিৎ বড়ো — কিন্তু আসলে স্ত্রী সর্বদাই ভারতীয় চেতনায় সম্পর্কে ছোটো। নিখিলেশ, বিমলাকে মনে রেখে আমরা উনিশ শতকের আরো কয়েকজন বাস্তব দম্পতিকে দেখে নিতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বিধবা বিবাহ করেন গুরুচরণ মহলানবিশ। তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পিতামহ। গুরুচরণের স্ত্রীর নাম রুক্মিণী। আত্মকথায় গুরুচরণ দাবি করেছেন রুক্মিণীদেবীকে পদব্রজে আরপুলি লেন থেকে রাধানাথ মল্লিকের স্ট্রিটে ব্রাহ্মিকা সমাজে পাঠানোর ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর — এবং 'স্ত্রী স্বাধীনতার সূত্রপাত ও পোষাক পরিবর্তন'-এর ইতিহাসে এই ইচ্ছা যুগান্তর আনে। গুরুচরণ এই ব্যাপারে আলোচনা করে বন্ধু কামাক্ষ্যাচরণ ঘোষ, মধুসূদন লাহিড়ী, হরগোপাল সরকারের সঙ্গে। রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হলে মেয়েদের পোশাক পরিবর্তন করা দরকার তাঁরা এ বিষয়ে একমত হন।

'তখনই স্থির হইল যে মেয়েদের গায়ে একটি সেমিজ ও জ্যাকেট এবং মাথা হইতে পা পর্যন্ত, একখানা চাদর এবং একজোড়া চটিজুতো দেওয়া আবশ্যক।' গুরুচরণ রুক্মিণীকে নতুন পোশাক তৈরি করিয়ে দিলেন ও তা পরিয়ে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে গোলদিঘির দক্ষিণ দিক দিয়ে হাঁটিয়ে ব্রাহ্মিকা সমাজে নিয়ে যেতেন। 'এখন এই যে লক্ষ লক্ষ টাকার স্ত্রীলোকের পোষাক ও জুতো বাজারে বিক্রি হয় প্রথমে আমিই ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলাম।' এর কিছুদিন পর এক খ্রীস্টান বন্ধুর স্ত্রীকে গাউন পরতে দেখে গুরুচরণের বড়ো ভালো লাগে। তিনি স্ত্রীকে গাউন, বুটজুতা ও মাথার চাদর প্রস্তুত করে দেন। তাঁর বন্ধু অঘোরবাবু যদুবাবু এবং বিজয়বাবু রুক্মিণীর এই পোশাক দেখে 'খুব পছন্দ' করেন। অনেকেই নিজেদের পত্নীদের এই পোশাক পরাতে থাকেন। এঁদের মধ্যে লাখুটিয়ার জমিদাররা ছিলেন। সমালোচনা কম হয়নি, কিন্তু গুরুচরণ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'যখনই ভাল বুঝিব তাহাই করিব।' মেয়েদের জুতো তখন বাজারে পাওয়া যেত না। গুরুচরণ রুক্মিণীকে একজোড়া তালতলার হলদে রঙের চটি কিনে দিয়েছিলেন। (বিমলার চটি প্রসঙ্গ স্মরণীয়) গোটা ঘটনায় রুক্মিণীর মতামত কোথাও নেওয়া হয়নি, সবই তাঁর স্বামী এবং স্বামীর বন্ধুদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত। বিমলার দুই জা যা দেখে ঈর্ষায় জ্বলতে থাকতেন সেই সব হাল ফ্যাশনের সাজসজা 'সেই সমস্ত রঙ-বেরঙের জ্যাকেট - শাড়ি - সেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন' তাতেই বা বিমলার নিজস্ব মতামত কতোটা ছিল? নিখিলেশের ইচ্ছে পূরণ করতেই বিমলা নিজেকে সাজিয়েছে। বিমলার দিদিশাশুড়ি সেকেলে মানুষ

কিন্তু অদ্ভুত একটি মন্তব্য তিনি করে ফেলেছেন যা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে, 'আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর কাউকে সাজাতে যেত।'

'ঘরে বাইরে'তে বাঙালির দাম্পত্যের বিবর্তনকে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য শিল্পিত ভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে পুরুষের আকাঙ্ক্ষার যে চাপ ছিল যথাযথ ভাবে তা দেখিয়েছেন। বিমলাকে বাইরে বের করাও নিখিলেশের ইচ্ছা। এটি একটি অভিনব নিরীক্ষা, এক্সপেরিমেন্ট। এখানেও গিনিপিগ কিন্তু বিমলা। স্বামী স্ত্রীর সংলাপ কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল।

> 'আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকি আছে।
>
> কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়?
>
> এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—
>
> তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।
>
> খুব জানি গো খুব জানি।
>
> মনে করছ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।'

কিন্তু নিখিলেশ হয়তো লক্ষ্য করেও করেনি যে বিমলা যেটুকু মতামত প্রকাশ করেছে তাতে তার স্বামীর মতের প্রতিধ্বনি নেই। নিখিলেশের চিনির কল বসানো কিংবা ব্যাঙ্ক খোলা, তাতে প্রচণ্ড লোকসানে বিমলাও যে উদ্বিগ্ন হয়নি তা নয়, তাঁতের কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র অথবা স্বদেশী জাহাজ কোম্পানিতে টাকা ঢালার গল্প যেভাবে বিমলা বলেছে তাতে সমর্থনের কোনো সুর নেই। সন্দীপের নানা কার্যক্রমে এবং খামখেয়ালে নিখিলেশ যে অকৃপণ সাহায্য করেছে তাতেও বিমলা বিরক্ত হয়েছে। এই সব ঘটনাক্রমের বাস্তবপট হিসেবে ঠাকুর পরিবারের নানা ব্যর্থ বাণিজ্যপ্রচেষ্টা, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশী জাহাজ কোম্পানি, রবীন্দ্রনাথের নিজের নানা উদ্যোগের স্মৃতি স্বভাবতই আছে। তেমনি স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপারে অন্যতম পথিকৃৎ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছায়াও নিখিলেশের মধ্যে অবশ্যই পাবো। দেশের কাজে বিমলাকে ঠিক সাথী হিসেবে নিখিলেশ কখনোই পায়নি। সেই বিমলাই একটি বিশেষ কালের টানে নতুন করে জেগে উঠল। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলন কীভাবে অন্তঃপুর অর্থাৎ ঘরের মধ্যে বাহিরকে নিয়ে এল তা যেন নাটমন্দিরের সন্দীপের বক্তৃতার সময় একটি সাংকেতিক ঘটনায় দেখানো হয়েছে। চিক সরিয়ে ফেলে বিমলা যেখানে তার রাজনৈতিক নেতাকে চিনে নিচ্ছে। কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো 'সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ' বিমলার মুখের ওপর এসে পড়েছে। নিখিলেশের ধৈর্যশীল চেষ্টায় যা হয়নি রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝাপটায় তা এক লহমায় ঘটে গেল। কিন্তু এমনটিই তো ঘটে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পরে আর একটি ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত — 'দেশভাগ' পূর্ববঙ্গে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু হিন্দুর অন্তঃপুরের বেড়া ভেঙে আরো বিপুল তেজে বাহিরকে সেখানে প্রবিষ্ট করিয়েছিল। আমাদের ছোটো ছোটো

ঘরোয়া বৃত্তগুলিকে এভাবেই ভাঙচুর করে ইতিহাসের বড়ো সময় বয়ে চলে।

বিমলা যে সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তা নিখিলেশ প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে। বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলাকে দেখার ইচ্ছে ছিল নিখিলেশের। কিন্তু যখন বিমলা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, সন্দীপকে নেতা বলে মেনে নিয়ে, নিখিলেশের মনে হয়েছে,

> 'আজ পর্যন্ত বিমল একজায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। ... ধৈর্যের পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমনকি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে। ভেবেছিলুম বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা'।

জীবনের সহজ সরল রসকে বিমলা লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন করে জিভের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায় অন্য স্বাদকে অবজ্ঞা করে— এমনটাও মনে হয়েছে নিখিলেশের। 'মণিহারা' গল্পে নারীর লঙ্কা, তেঁতুল ও কড়া স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রসঙ্গে স্কুলশিক্ষক গল্পবক্তার মন্তব্য মনে পড়ে। এমনকি নারীর প্রতি মোহ সম্বন্ধে নিখিলেশের এতটাও মনে হয়েছে,

> 'প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে,এমন পূজা আমরা মানব না। সাজে সজ্জায়, লজ্জা শরমে, গানে-গল্পে, হাসি-কান্নায় যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেছে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

এই অনুভূতি প্রায় টলস্টয়ের 'ক্রয়টজার সোনাটা'র নায়কের মতো। আশ্চর্য, যে নিখিলেশের এই কল্পনায় কালী-মিথের প্রভাব আছে।

২

নিখিলেশের এই মূল্যায়ন কি যথার্থ? বিমলা তবে এমন স্থূল প্রকৃতির মেয়ে, যাকে কাগজের খেলা নৌকার মতো নর্দমার ঘোলা জলে ডুবে যেতে দেখে সে যন্ত্রণা পাচ্ছে? এখানে একটা প্রশ্ন উঠে পড়ে 'ঘরে বাইরে' প্রেমের উপন্যাস নাকি রাজনৈতিক? সমালোচকদের অনেকেই প্রেমের উপন্যাস বলে দাগিয়ে দিয়েছেন, রাজনীতি নাকি শুধু পটভূমি। আদতে রাজনীতি এই উপন্যাসের তন্তুতে তন্তুতে মিশে আছে। প্রেম ও রাজনীতি এখানে পাকে পাকে জড়ানো। সেই রাজনীতির সূত্র ধরেই অনেক ধরণের ঘর ও বাহিরের ইঙ্গিত এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। শুধু নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্যের ঘর ও বাহির নয়, একটি বনেদী বাড়ির গৃহবধূর অন্তঃপুরের শান্তজীবনের ছন্দকে রাজনৈতিক

আন্দোলন ও প্রেমের ঝাপটায় বিপর্যস্ত করা নয়। দেশের সেই মুহূর্তের রাজনৈতিক সংকটও যেন এক ঘর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব— ঝড় এসেছে সেখানেও। বিমলার মতো দেশও সেই ঝড়ে টলমল করছে, দ্বিধায় বিদীর্ণ হচ্ছে, এতোদিনের চেনা পথ ছেড়ে এক অজানা পথে পা বাড়াচ্ছে, গন্তব্য ও ভবিষ্যৎ দুই-ই অজানা এবং অনিশ্চিত। দেশের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের এই অদ্ভুত মিল বিমলাকে ভাবিয়ে তুলেছে, একে শুধু নিখিলেশের কথা মতো 'উৎকটের' প্রতি ভালোবাসা লেবেল দিয়ে ছোটো করা যায় না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের আত্মা জেগে উঠেছিল। দেশের অন্তরে সুপ্ত শক্তিকে অনুভব করার দুর্লভ মুহূর্ত সমাগত হয়েছিল। বিমলা জানিয়েছে,

> 'সমস্ত দেশের উপর এই-যে একটা প্রধান আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। ... তাই সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে, 'বন্দে মাতরং' আমার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেছে 'বন্দে'— কোন অজানাকে, অপূর্বকে, কোন্ সকল সৃষ্টিছাড়াকে।
>
> দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল। এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েছি। ... আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। ... এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ। সেই আবেগে সে চলেছে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুই-ই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা।'

বাংলাদেশের অন্তঃপুরিকারা কীভাবে সেদিন এই দেশপ্রেমের আবেগে সাড়া দিয়েছিল বিমলার মধ্যে সেই আখ্যানটি রয়ে গেছে। সন্দীপের প্রতি বিমলার মুগ্ধতা শুধু সে সুদর্শন, সুবক্তা বলে নয়, সে উদ্দীপনা জাগানো এক দেশনেতা বলেই। বিমলার প্রেম তাই শুধু প্রেমিকের কাছে নিজেকে নানা বর্ণিলতায় উপস্থিত করা নয়, মূলত এটি অধিনেতা বন্দনা। সন্দীপ অবশ্য জেনে বুঝে তার সম্মোহনের মায়াজাল ছড়িয়েছে। সে মনে করে পৃথিবী জয় করবার শক্তি হল হিপ্‌নটিজম। সত্যের জয় নয়, তার মতে জয় হবে মোহের। এ ব্যাপারে পৃথিবী বিখ্যাত একনায়কদের সঙ্গে, স্বৈরতন্ত্রীদের সঙ্গে তার চরিত্রের মিল প্রকট। ফাশিজমের কুললক্ষণ প্রকাশ পায় নেতার আবেগ আলোড়নকারী বক্তৃতায়, তৈরি হয় গণ হিস্টিরিয়া, মারাত্মক সম্মোহ। নেতার প্রতি সার্বিক নির্ভরতা এবং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে নেতার কথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে যেকোনো কাজ ন্যায় অন্যায় বিচার না করে সমাপ্ত করে ফেলতে কোনো দ্বিধা জাগে না ভক্তের মনে। বিমলাকে দেশলক্ষ্মীর সঙ্গে একাকার করে

সন্দীপের কাব্যিকস্তুতি শ্রোত্রীর এই মানসিক অবস্থাই তৈরি করেছে। বিমলাকে আমরা সন্দীপের পা জড়িয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে দেখেছি, গহনার ভাণ্ডার উজাড় করার প্রতিশ্রুতি দিতে দেখেছি, স্বামীর সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে সন্দীপকে দিতে দেখেছি। সে নিজেই ভেবেছে এ তো তার স্বভাব নয়। বিমলা যেন সর্বনাশের আগুনে আত্মাহুতি দিতে চলেছে। নিজের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবার এই তাড়না শুধু যৌনতার তাগিদ নয়। প্রতি মুহূর্তে বিমলা ভাবছে সন্দীপের প্রতি প্রেম তাকে দেশের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। তাঁর আত্মদান আসলে স্বদেশের বেদীমূলে অর্পিত। এইজন্য যখনি দেশের কথা বন্ধ হয়ে আধুনিক কালে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, ইংরেজি ও বৈষ্ণব কবিতা, আর্টের কথা, নিরাবরণ ছবির প্রসঙ্গ সন্দীপ বিমলার সামনে তুলেছে, সে সংকোচ বোধ করেছে, তার মন গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু দেশের কথার সঙ্গে তার স্তব মিশিয়ে সন্দীপ যখন মোহ রচনা করেছে তার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদ যে উন্মাদনা তৈরি করতে পারে একমাত্র ধর্ম ছাড়া তার সঙ্গে পাল্লা দেবার স্পর্ধা কে-ই বা করতে পারে! অন্তঃপুরের বাসিন্দা বিমলা যতোই মিস্ গিলবির কাছে বিলিতি বিদ্যা শিখুক এই অনুভূতির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। নিখিলেশের বক্তব্যের আবেদন প্রধানত যুক্তি, বুদ্ধি, মননের কাছে, সন্দীপ খুব হিসেব করে আবেগের স্রোতে ভাসাতে পারে। বিমলা যে আবেগের জোয়ারে ভেসেছে তাতে তার পক্ষ থেকে সবটুকু ফাঁকি ছিল না— পথ ভুল হলেও, দেশের জন্য কিছু করার ইচ্ছেটা আন্তরিক ছিল। কিন্তু রাজনীতি ও প্রেম দুদিক দিয়েই চোরা ঘূর্ণি যে তাকে নীচে টানছে এটি সে অনুভব করে নি। সন্দীপের রাজনীতির ভয়ংকরত্ব সে বুঝেছে অমূল্যর তরুণ কণ্ঠে নিখিলেশের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মেরে টাকা লুঠের প্রস্তাব শুনে। অমূল্য টেবিলে রেখেছে পকেট এডিশন গীতা আর ছোটো পিস্তল। খাজাঞ্চি যে সংসারে, তার পরিবারের কাছে কতখানি মূল্যবান তা অমূল্যর কাছে বিচার্য নয়। সেখানে ফাঁকা আকাশ; 'সে আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে : ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে উৎকণ্ঠা, আতঙ্কে বিমলার বুক কেঁপে উঠেছে। তার ভেতরে 'মা' জেগে উঠেছে। তার মনে হয়েছে, এই ছেলেটি অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুকতে চলেছে। একে কে বাঁচাবে। মাতৃত্বের অনুভূতি এর পর বিমলার রক্ষাকবচ হয়েছে। গিনিগুলি পেয়ে আত্মহারা সন্দীপ যখন বিমলার দিকে ছুটে এসেছে, অমূল্য সামনে আছে এই চেতনাই বিমলাকে সাহস দিয়েছে প্রাণপণ বলে সন্দীপকে ধাক্কা দিতে। পরে বিমলা সন্দীপের প্রভাব সম্পর্কে যা বলেছে, তা সত্যবোধে প্রদীপ্ত।

> 'মানুষের বোধহয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে, সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে। কিন্তু আমার আর একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেইজন্য ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে, কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।'

এর আগেই নিখিলেশ তাকে এক সন্ধ্যায় বলতে পেরেছে, 'আমি তোমাকে ছুটি দিলুম।' ছুটির অর্থ কী তা নিয়ে সংশয় নেই, নিখিলেশ বিমলাকে ত্যাগ করতে চায়। ছুটি অর্জন নয়, ছুটি দেওয়া। এই কথার মধ্যে প্রভু ও দাসীর সম্পর্কের ছায়া অস্পষ্ট থাকে না। নিখিলেশের আত্মগ্লানিও চরমে পৌঁছেছে তখন। তার মনে হয়েছে, বিমলাকে সে জীবনে অনাবশ্যক বড়ো করে তুলেছে। 'তাকেই দিন রাত সাজিয়েছি, পড়িয়েছি, শিখিয়েছি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেছি; মানুষ যে কত বড়ো জীবন যে কত মহৎ, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারিনি।'

এখানে একটা প্রশ্ন উঠেই পড়ে, বিমলা তো নিখিলেশের জীবনে এতখানি জায়গা জুড়তে চায়নি। তার ইচ্ছা অনুসারে নয়, নবজাগ্রত শিক্ষা ও আধুনিকতার তাড়াতেই নিখিলেশ নিজের ভ্রষ্ট চরিত্র মদ্যপ দাদাদের থেকে পৃথক জীবনযাপনে স্ত্রীকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে চেয়েছে। তবে বিমলা যে নিখিলেশের মনোমত নারী প্রতিমা হয়ে ওঠেনি, তাতে সন্দেহ নেই। জীবনে কাজের ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই মানুষ শিক্ষা দেয়— কিন্তু বিমলা রাজনীতির আদর্শে স্বামীর বিরুদ্ধে গেছে, বিরুদ্ধপন্থী রাজনৈতিক নেতার প্রতি মোহাসক্ত হয়েছে— এতটা গ্রহণ করা সহিষ্ণু নিখিলেশের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। তাই 'ছুটি' দেওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। নিখিলেশ বিশ্বাস করে, শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হবে যে, মন আপনিই বিকশিত হয়ে নিজের পথ বেছে নেবে। তাই সে বিমলাকে বাধা দেয় নি। কিন্তু ছুটি দিয়েছে। ছুটির ভিতরের অর্থটি নির্মম— সেখানে মার্জনা নেই। এই প্রসঙ্গে বিমলা বলেছে, 'ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিংবা নেওয়া যায়! ছুটি কি একটা জিনিস! ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি, হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি' তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারিনে, বাঁচতেও পারিনে।' এই আত্যন্তিক নির্ভরতা, এবং এক ধরনের দাস্যবৃত্তি বিমলার মধ্যে খুবই প্রবল। যুগ পটভূমি বিচারে তা অস্বাভাবিকও নয়। ভোরবেলায় উঠে স্বামীর পায়ের ধূলো নেবার অভ্যাস তার কাছে শুধু প্রথা মানা নয়, উপন্যাসে তাকে বার বার পরম্পরাক্রমে কখনো সন্দীপ, কখনো নিখিলেশের পা জড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখা গেছে। সে সর্বদাই তার জীবনের অধিষ্ঠাতাকে দেবতা রূপে দেখতে চেয়েছে, যার বেদী অনেক ওপরে। সন্দীপের মনভোলানো রং উঠে গিয়ে খড়মাটির কাঠামো বেরিয়ে পড়ার পর বিমলার নিজের জীবনের পুরাতন দেবতাটির পদতলে আত্মনিবেদনে বাধা হবার কথা নয়। আখ্যান থেকে আমরা জানি নিখিলেশ সন্দীপকে নানা কারণেই প্রভূত অর্থসাহায্য করেছে। কিন্তু সে তার নিজের টাকা। বিমলাকে টাকা দিতে হয়েছে লুকিয়ে, চুরি করে। মুখ ফুটে চাইতে পারে নি। স্বামী ছুটি দিয়ে দেবার পর তা সম্ভবও ছিল না। গহনা অবশ্য তার স্ত্রীধন। তাই নিখিলেশের সামনেই গহনার বাক্স সে সন্দীপের হাতে তুলে দিতে পেরেছিল। সম্পত্তি সম্বন্ধে মেয়েদের অধিকারের সীমানা এই আচরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ ছাড়াও স্বদেশকে পরাধীনতা মুক্ত করার কাজে নাম না জানা মেয়েরা গহনা তুলে

দিয়েছে নেতা বা কর্মীদের হাতে, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর সভায় একবার অন্তঃপুরিকারা সব গহনা খুলে স্বদেশ সেবায় নিবেদন করার পর, পরের বার বাড়ির বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন কর্তারা ঘরের মেয়েদের গা ভরা গহনা পরে গান্ধীর সভায় যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। বিমলা যে নিখিলেশের শেখানো আদর্শকে পাশে ঠেলে ছাঁচ ভেঙে সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে সর্বাংশে আত্মবলিদান করতে গিয়েছিল, এটি তার পারিবারিক সামাজিক অনড় অবস্থানের বিরুদ্ধে এক ধরনের অসচেতন বিদ্রোহ।

কিন্তু এই বিদ্রোহ সফল হবার নয়। তার অন্যতম কারণ, তার নেতার আদর্শহীনতা। এছাড়া পথটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণাও বিমলার ছিল না। অমূল্যকে মারণ ও মরণের পথে ছুটতে দেখে তার চৈতন্যোদয় হয়। সব শেষে ধনী বাড়ির গৃহবধূর সুখ লালিত জীবন ছেড়ে কঠিন সংগ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ার সাহস বিমলার ছিল না। অবশেষে নিখিলেশও বুঝতে পেরেছে, স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধটিকে সে একটি নিখুঁত ভালোর ছাঁচে ঢালাই করে আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল। দুজনেরই ভুল ভাঙার পর স্বামী স্ত্রীর রূপকথার ঢঙে 'চিরকাল সুখে কাটিল' হতে পারত কিন্তু 'ঘরে বাইরে' তো শুধু প্রেমের উপন্যাস নয়, ত্রিকোণের জটিল জ্যামিতি নয়। যে রাজনীতি এই উপন্যাসের প্রধান চালিকাশক্তি তার ইতিবৃত্ত তো আরো অনেক দূর পথ যাবে।

সেই ভাঙন কালের অব্যর্থ ইশারা উপন্যাসে আছে। সন্দীপের বিভেদপন্থী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন লেলিহান হয়েছে। অঞ্চলের স্থিতাবস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়েছে। চন্দ্রনাথ বাবু সেই সর্বনাশা বার্তা দেবার পর নিখিলেশ নিরস্ত্র অবস্থায় ঘোড়া ছুটিয়ে দাঙ্গা থামাতে চলে গিয়েছে। সংঘর্ষে অমূল্য গুলিবিদ্ধ নিহত। নিখিলেশের মাথায় ভীষণ চোট, সে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে— উপন্যাস এই খবরটুকুই দেয়। কিন্তু ইতিহাস তো আরো অনেক মর্মান্তিক খবরের পুঞ্জিত রূপ নিয়ে আছে। 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হবার তিন দশক পরের সেই রক্তাক্ত প্রহর মনে করে ঔপন্যাসিকের প্রজ্ঞা দৃষ্টির সামনে স্তব্ধ ও বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

৩

> 'India has never had a real sense of nationalism. Even though from childhood I had been taught that idolatry of the Nation is almost better than reverence for God and humanity, I believe I have outgrown that teaching, and it is my conviction that my countrymen will truly gain their India by fighting against the education which teaches them that a country is greater than the ideals of humanity.'
>
> (Nationalism in India/ Nationalism)

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত সে যুগে কেন এ যুগেও দ্বিধা ও অসন্তোষের ঢেউ তুলতে সক্ষম। তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই বার্তা দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন। 'ঘরে বাইরে'তে এই বার্তা রণিত হচ্ছে। সমালোচক যতীন্দ্রমোহন সিংহ উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখলেন, 'কবি অবশ্যই স্কুল মাস্টারী করিতে বসেন নাই এবং তাঁহার নিকট আমরা কোন উচ্চশিক্ষার আশা করি না। কিন্তু এই পূতিগন্ধময় কাব্য রচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।' উপন্যাসটি 'পরকীয়া পীরিতি'র বিশ্লেষণ বলেই তাঁদের মনে হয়েছিল। অনেকের এটিও মনে হয়েছিল তিনি ১৩১২ (১৯০৫) সনের ঝাল ১৩২২ সনে মেটাচ্ছেন। এই তথ্য সুবিদিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধ, দেশাত্মবোধক গান লেখা ছাড়াও নানা সভা সমিতি, রাখীবন্ধন উৎসবে যোগদান— এ সব তথ্য সকলেরই জানা। ১৯০৫ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর এই সময়টুকু দৃষ্টান্ত হিসেবে সামনে রাখলে দেখা যায় তিনি মল্লিকবাজার ট্রামডিপোর কাছে আবদুল্লা রসুলের সভাপতিত্বে মুসলমানদের এক সভায় উপস্থিত থাকছেন, পটলডাঙায় চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে বিপিনচন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছাত্রদের সভায় উপস্থিত হচ্ছেন, বাংলার মেয়েদের জাতীয় ধনভাণ্ডারে দান করার আহ্বান সম্বলিত প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করছেন, 'ব্রতধারা' প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, শঙ্করঘোষ লেনে 'ডনসোসাইটি'র সভায় ছাত্রজমায়েতে স্বদেশী শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন। কংগ্রেসে পূর্ব থেকেই বর্তমান নরমপন্থা ও চরমপন্থার বিরোধ এই সময় ক্রমবর্ধমান। রবীন্দ্রনাথ এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আবিল মূর্তিটি দেখে আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন দেখা যায়। স্বদেশ নিয়ে নবপর্যায়ের গানের ধারাও শুষ্ক হয়ে এল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর যন্ত্রণাটি ফুটে উঠেছে।

> উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনোকালেই 'লীডার' বা জনসংঘের চালক নহি— আমি ভাট মাত্র— যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি... "নেতা" হইবার দুরাশা আমার মনে নাই— যাঁহারা "নেতা" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি— ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।'

কিন্তু শুধু গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়, আরো গভীর একটি ভেদ ক্রমশ বড়ো হচ্ছে তা তাঁর সংবেদনশীল মনে ধরা পড়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান বাংলার তথা ভারতের এই দু সম্প্রদায় যে আলাদা দুটি জাতি এমন ধারণা উনিশ শতক থেকেই ডালপালা মেলছিল, এই বিষয়ে বাগবিস্তার বাহুল্য মাত্র। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কীভাবে সাম্প্রদায়িক দূরত্বের পালে

সুবাতাস লেগেছিল তা আজ বহু আলোচিত। হিন্দু সমাজে বিশেষ করে হিন্দু ভদ্রলোকদের মধ্যে যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার ধর্মীয় চারিত্র্য খুব স্পষ্ট ছিল। গুপ্তসমিতিগুলিও এই সময় শক্তি বাড়ায়। প্রমথনাথ মিত্র বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে ঢাকা পরিদর্শন করেন ১৯০৫ সালে। বিপিনচন্দ্রের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতার পর ঢাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। কিছু ছাত্র মসজিদের সামনে আওয়াজ করে স্থানীয় মুসলমানদের বিরক্ত করে, সেবার দাঙ্গা প্রায় লাগে লাগে হয়েছিল। সমিতিগুলির সদস্যপদে মুসলমানদের সাধারণত নেওয়া হত না। তার কারণগুলি হল তারা সমিতির ধর্মীয় শপথ মানবে না, হিন্দুমুসলমানের অভ্যাস, আচার আচরণ ও প্রথা আলাদা এবং পরস্পরের কাছে নিন্দনীয়। তাছাড়া মুসলিম সদস্যরা দলত্যাগ করে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দলের ক্ষতি করতে পারে। আশা ছিল দুয়েক বছরের মধ্যেই মুসলমানরা হিন্দুদের বশ্যতা স্বীকার করবে। পূর্ববাংলা ও আসামের গভর্নর ব্যাম্পফিল্ড ফুলারের উস্কানিতে ঢাকার মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দু ভদ্রলোকদের বিরক্ত করতে শুরু করে। ১৯০৬ তে জন্মাষ্টমীর মিছিল উপলক্ষ্য করে উত্তেজনা বাড়ে। ১৯০৬ তে ঢাকায় মুসলিম লীগেরও জন্ম হয়। হিন্দু যুবকরা স্বদেশিকতার সঙ্গে গীতা বা চণ্ডীকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন শত্রুসংহারের লক্ষ্যে। মুসলমানরা এই সব গ্রন্থের অনুকূলে ছিলেন না বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁরাও পাল্টা এক স্বাদেশিকতায় জেগে উঠলেন। হিন্দুদের কাজ না করা, হিন্দুদের তৈরি জিনিস না কেনা, হিন্দুদের বিদ্যালয়ে না পড়া, হিন্দুদের কাজ না দেওয়ার আহ্বান দেওয়া হল। Red Pamphlet নামে একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল এক মৌলবীর প্ররোচনায়, যা গ্রামের লোকেদের কাছে 'জিহাদ' প্রচার করেছিল। এই পুস্তক গুজব ছড়িয়েছিল যে তারা ঢাকার নবাবের কাছ থেকে পরোয়ানা পেয়েছে হিন্দুদের লুঠ করার এবং আশ্বাস রয়েছে যে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির 'ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল' সফল হবার সুযোগ খুলে গেল। রজতকান্ত রায় লিখেছেন, 'কয়েক বছর বাদে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়, কিন্তু আরেকটি বঙ্গভঙ্গের বীজ ইতিমধ্যে উপ্ত হয়। পূর্ববাংলার নদীমাতৃক বিস্তীর্ণ এলাকায় জমি, ধর্ম একযোগে দুটি পরস্পরবিরোধী মানসিক গোষ্ঠী তৈরি করে, একদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোক, অন্যদিকে সামাজিক ভাবে ক্ষুব্ধ মুসলিম সম্প্রদায়।' এই সব অশুভ ঘটনার উল্লেখ 'ঘরে বাইরে'তে খুব স্পষ্ট রেখায় আছে।

বয়কট নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের উৎসাহ যতোখানি দেখেছেন সেই তুলনায় স্বদেশী শিল্প স্থাপনের উৎসাহ লক্ষ্য করেননি। যে কোনো ব্যাপারেই জবরদস্তি তাঁর ঘোর অপছন্দ ছিল। জোর করে কারো দোকান থেকে বিলিতি কাপড় তুলে নেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া, ব্যাপারীদের ক্ষতি করা যে উত্তেজনার আড়ালে দেশের মানুষকে অবজ্ঞা করা, দূরে ঠেলে দেওয়া, তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতি নির্মমতা— এই সব কথা তিনি বার বার বলেছেন ও লিখেছেন এবং বিদ্রূপ ও তিরস্কার কুড়িয়েছেন।

বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্য কোনো গোপন তথ্য নয়। বিপিনচন্দ্রের কোনো কোনো মতের প্রতিধ্বনি সন্দীপের কথায় আছে, তাতেও সন্দেহ নেই। হিন্দু পৌত্তলিকতাকে আদর্শের প্রত্যক্ষ রূপ বলে বর্ণনা করেছিলেন বিপিনচন্দ্র। 'আইডল' নয় তাঁর মতে এ হল 'আইডিয়ালের' পুজো। ধর্মীয় কল্পনার সর্বোচ্চ সমুন্নতি তিনি এই প্রক্রিয়ার দেখেছেন। আন্দোলনের পথে কীভাবে সব বাধা চূর্ণ করতে হবে সে বিষয়েও বিপিনচন্দ্রের কোনো দ্বিধা ছিল না।

> 'That which the social organism needs for its own self preservation it accepts irrespective of all considerations as to whether it is true or false, noble or ignoble. That which has no reference to this supreme need it either indifferently brushes aside or violently throws out.'.

সন্দীপও বলেছে 'আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচার বিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে। ... আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে। সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানে না— শুধু আমিই জানি; কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে, কাদায় তার গা ভরে যাবে, তাকে বিচার করতে দেব না — তাকে ছোটাব।'

বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। দেশের যুবসমাজের উপর অপ্রতিহত ছিল তাঁর প্রভাব। ১৯১৪ সালে দোসরা আগস্ট রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে লেখেন, 'অনেক দিন পর্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুলছিল ... দেশের কোনো জায়গা থেকে কি এরা ধাক্কা পাবে না?'

সন্দীপের খল চরিত্র অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ দেশপূজ্য রাজনৈতিক নেতাদের অন্যায় আঘাত করেছেন এই অভিযোগ খুবই জোরালো। বিপিনচন্দ্র ছাড়া এই তালিকায় আছেন স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ। সেই অরবিন্দ যাকে রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কার' জানিয়েছিলেন। 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা সূত্রে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হন ১৬ অগস্ট ১৯০৭, সেইদিনই জামিনে মুক্তি পান। রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কার' কবিতাটি লেখেন ২২ অগাস্ট। 'বন্দেমাতরমে' অরবিন্দের অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধগুলি ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 'দি মর‍্যালিটি অব বয়কট' প্রবন্ধটি অবশ্য পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে বলে প্রকাশ পায়নি। এটি কোর্টে পেশ করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে অরবিন্দ কঠোর ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বয়কট বিরোধিতার সমালোচনা করেছিলেন।

> 'এক ধরনের মন আছে যা আক্রমণাত্মক ব্যাপারের কথা মনে হলেই সিঁটিয়ে পেছিয়ে যায়, যেন ওটা কতই পাপে ভরা। ... ঘৃণা যেমন নৈতিকতার হানিকর হতে পারে, তেমনি হতে পারে উজ্জীবকও। ... বয়কট বলবৎ করার ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তির প্রশ্ন উঠেছে। ব্যাপারটা কৌশলগত; প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িত। হিংসাত্মক কোনো ঘটনা যদি আমাদের সংঘর্ষের মধ্যে ঠেলে দেয় তাহলে তা

আমাদের মতো অবস্থায় পতিত জাতির পক্ষে তো সহায়ক। এখানে নৈতিকতার প্রশ্ন আসে না। হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করলে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়— এই যুক্তি রাজনীতির নিজস্ব চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সূচক। রাজনীতি মানেই তো ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।'

'আওয়ার রুলার অ্যাণ্ড বয়কট' লেখাটি আরো তীব্র। এখানে সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ না করা হলেও লক্ষ্যে তিনিই আছেন। 'বয়কট যেহেতু শাসকদের সুখসেব্য ঔষধ নয়, তাই কিছু মোলায়েম মানবতাবাদী ব্যক্তি আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের চোখে ব্যাপারটিকে দেখেন। তাঁরা বলেন হাঁ, আমরা অবশ্যই দেশকে ভালবাসব, কিন্তু দেখতে হবে, সে ভালবাসা যেন বিজাতীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চার না করে। হাঁ, আমরা স্বদেশী দ্রব্যকে পছন্দ করব, তাদের উৎপাদনের উন্নতি ও বিস্তারের চেষ্টাও করব, কিন্তু বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ অতি জঘন্য। বাঁধা বুলি এই রকম : কোনো জাতিই ঘৃণা ও বিদ্বেষের সাহায্যে নিজেদের উন্নতি করতে পারে না, ইত্যাদি। কিন্তু অপর পক্ষে ঐতিহাসিক তথ্যযোগে অধিক সঙ্গতভাবে এই যুক্তি দেওয়া যায়— কোনো জাতিই এতাবৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালবাসা, দয়াদাক্ষিণ্য এবং বিশ্বজনীনতার দ্বারা নিজেদের উন্নতি ঘটিয়েছে দেখা যায় নি।'

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের খোলাখুলি মত সংঘর্ষে ভেঙে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রবন্ধ। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট আক্রমণে নিহত হলেন মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি। মানিকতলা বোমার মামলার বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হলেন। অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন দোসরা মে, ১৯০৮। এরপর রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে নানাভাবে আঘাত করে গিয়েছেন। তারফলে সাধারণ দেশবাসী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ক্ষুব্ধ হয়েছেন কারণ ত্যাগী দেশব্রতীদের সম্পর্কে, দেশের জন্য যাঁরা প্রাণদান করতে দ্বিধা করেন না তাঁদের সম্বন্ধে জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সামান্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মতে এই পবিত্র আবেগে ঘা দিয়েছিলেন। এই দলে অবশ্য যদুনাথ সরকার ছিলেন না। তিনি সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ছিলেন না। সন্দীপ চরিত্রের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষের ছায়া তিনিই দেখেছিলেন। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ১৯১৯ সালে 'ঘরে বাইরে'র ইংরেজি অনুবাদ 'দি হোম এণ্ড দি ওয়ার্ল্ড' এর সমালোচনা সূত্রে মারাত্মক কথাটি তিনি বললেন। উল্লেখযোগ্য যে রক্ষণশীল যদুনাথ হিন্দুনারী বিমলার বাইরের জগতে নিষ্ক্রমণ মোটেই সমর্থন করেন নি। তাঁর মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ অন্তঃপুরিকার বাইরে আসা এবং দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্ত হবার বিপদই নির্দেশ করেছেন। তিনি এই উপন্যাসে সন্দীপের চরিত্রের মধ্যে অরবিন্দের শানানো আক্রমণের উত্তর রবীন্দ্রনাথ কীভাবে দিয়েছেন সেই কৌশল লক্ষ্য করেছেন।

'সন্দীপ মাতৃভূমির মহান সেবায় খোলাখুলি বলপ্রয়োগ ও চাতুরীর সমর্থন করেছে। লক্ষ লক্ষ পশ্চাদপদ মুসলমান ও অনুন্নত নমশূদ্রদের সম্বন্ধে সে চোখ

বন্ধ করে রেখেছে। তাদের পরিবর্তিত ও উন্নত করার এবং তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের দ্বারা স্বমতে আনার ধীর কিন্তু নিশ্চিত পথ গ্রহণ না করে, তাদের প্রতারিত সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করে দ্রুত উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশা সে করেছিল, যেন পূর্বোক্ত কাজগুলি খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। গোটা উপন্যাসটি প্রমাণ করেছে, ওসব মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয়। চারিত্রশক্তি, হৃদয়ের ঐক্য এবং বিসম্বাদ হীনতার উপর ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত না হলে তা বালির উপর প্রাসাদ হয়ে দাঁড়াবে।'

এই সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আদৌ স্বস্তিদায়ক হয়নি। সন্দীপের মতো নীচ, স্বার্থপর, লোভী চরিত্রের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নাম চলে আসা তাঁকে বিপন্ন করেছিল। আমেদাবাদের এক পত্রলেখকের উত্তরে তিনি শীঘ্রই 'মডার্ন রিভিউ' জানুয়ারি ১৯২০ তে জানালেন যে যদুনাথ নিশ্চয়ই বলতে চাননি সন্দীপ ও অরবিন্দ এক স্তরের মানুষ। অরবিন্দ যে একজন মহান ব্যক্তি তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমি এখনো তাঁকে নমস্কার জানাই, যা জানিয়েছিলাম প্রথম যখন তিনি ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন— শেষ পর্যন্ত যা তাঁকে বাংলা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করেছে।'

রাজনৈতিক মতাদর্শগত মিল থাকলেও সন্দীপ কখনোই বিপিনচন্দ্র পাল বা অরবিন্দ ঘোষ নয়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধি ও সুযোগবাদ, নীতিভ্রষ্টতা কোথাও তো দেখেছিলেন। মনে ও মুখে পৃথক থাকা, ব্যক্তিত্বের সম্মোহিনী জাদুস্পর্শে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিশেষত তরুণদের ভুল পথে চালিত করা— এ সব শুধু ঘরে বাইরে রচনাকালে নয় পরেও ভারতবর্ষ বহুবার দেখেছে। সমকালকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করছেন বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। সন্ত্রাসবাদী দেশপ্রেমিকদের অনেককে তিনি মতে না হলেও চারিত্র্যে যে শ্রদ্ধা করতেন, অমূল্য চরিত্রটি তার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই উপন্যাস লেখার সময় বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরো নিবিড় হয়েছে। আন্তর্জাতিকতার পটে তিনি পৃথিবীর ভবিষ্যতের আশাময় ছবি দেখতে পাচ্ছেন। অনেক দিক থেকেই নিখিলেশের কণ্ঠে রয়েছে তার রাজনৈতিক মতের প্রতিধ্বনি। নিখিলেশ বলেছে, "মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ভাবা-চিন্তা সমস্তই সমস্ত পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ— এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।' এভাবেই রচনাকালের মনন প্রবেশ করছে ১৯০৬-০৭ এর কালবৃত্তে। তৈরি হচ্ছে আরেক ঘর ও বাহির। বিশ্বের পটে ভারত। জাতি বর্ণ সম্প্রদায়ের ভেদ সরিয়ে বিশ্বমানবের যাত্রাপথে প্রধান বিঘ্ন সন্দীপরা, আজ তাদের সংখ্যা গোটা বিশ্বে অনেক বেশি। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ছলে বলে কৌশলে, নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে তারা দেশ দেশান্তরকে ত্রস্ত শঙ্কিত করে তুলেছে। নিখিলেশদের কণ্ঠ তাদের গর্জনে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, উদ্বাস্তু মিছিল,

অভিবাসন, সমস্যায় আন্তর্জাতিক ভারসাম্য হাবুডুবু— সক্রোধ উত্তর প্রত্যুত্তরে দিগন্ত কম্পিত। হিংসার লেলিহান আগুন জ্বলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। শতবর্ষ পেরিয়েও তার নিবৃত্তির কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই রক্তাক্ত পটভূমিতে ঘরে বাইরে উপন্যাস যেন এক মহাকাব্যিক মহিমা নিয়ে সমুন্নত হয়ে দাঁড়ায়। অজানা পাঠিকার বিরূপ সমালোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে সতেজ উত্তর দিয়েছিলেন তার একটি টুকরো দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করছি।

> '... আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তাহলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়। সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তাহলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করিনি।"

প্রবন্ধ ও গ্রন্থপঞ্জি

১. 'ঘরে বাইরে', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী

২. Nationalism, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পেঙ্গুইন

৩. স্বদেশী আন্দোলন : রবীন্দ্র-অরবিন্দ মতদ্বন্দ্ব শঙ্করীপ্রসাদ বসু
'রাতের তারা দিনের রবি' (সম্পাদক) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

৪. ভূমি ধর্ম ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি : পূর্ববাংলার চরমপন্থী হিন্দু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ১৯০৫-১৯১৭, রজতকান্ত রায় পরিকথা প্রসঙ্গ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ, মে ২০০৫,সম্পাদক দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

৫. 'আমি যে গান গেয়েছিলেম' প্রবুদ্ধ বাগচী, পরিকথা প্রসঙ্গ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ, সম্পাদক দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

৬. আত্মকথা : গুরুচরণ মহলানবীশ, আত্মকথা দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক নরেশ চন্দ্র জানা, মানু জানা, কমল কুমার সান্যাল, অনন্য প্রকাশন